বিজ্ঞান ও সভ্যতা

▣ নীহারেন্দু নাথ

১৯৪৫ সালে বিধ্বংসী পরমানু বোমার আঘাতে যখন ধ্বংস হল হিরোসিমা এবং নাগাসাকি শহর তখন লক্ষ মানুষের আর্তনাদ শোনে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন, "এই বিধ্বংসী হত্যাকান্ডের জন্য আমিই দায়ী, এর সব দায়ভার আমার, আমার আবিস্কৃত সূত্রটি যুদ্ধে ব্যবহৃত হোক এ কখনও আমি চাইনি, আমি যদি পুনর্জন্ম গ্রহণ করি, তাহলে আর বিজ্ঞানচর্চা নয়, এবার হব রাজমিস্ত্রি নয়ত ছুতোর।" পরমানু শক্তির স্রষ্টা মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের এই অনুসুচনা বাক্যটি আজ আমাদের, সকল বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীর এমনকি রাষ্ট্রনায়কদের ভাবতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে বিজ্ঞান ধ্বংসের জন্য নয়, শান্তির জন্য বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের মূলচরিত্র হল পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ এবং তার থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রকৃতির নিয়ম ও সত্যকে জানার অদম্য জিজ্ঞাসা থেকেই বিজ্ঞান ভাবনার জন্ম হয়। বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষনা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরিক্ষার দ্বারা সত্যকে উদ্ঘাটন করেন। কিন্তু আবিষ্কৃত সত্য বা সূত্রের বাস্তব প্রয়োগ বিজ্ঞানীদের হাতে থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রশক্তি এবং মুনাফালোভী বানিজ্যিক সংস্থার হাতে এর প্রয়োগ বা ব্যবহারের দায়িত্ব থাকে। তাৎক্ষণিক লাভ ও লোভের বশবর্তী হয়ে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োগ যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে তার উদাহরণ বলে শেষ করা যাবে না।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানবসভ্যতার উত্থান ও পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন যুগে লিবিয়া, মিশর, মেসোপটেমিয়া, পারস্য ইত্যাদি অঞ্চলে গ্রীক, রোমান ও সুমেরিয়ানদের সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বিজ্ঞানের হাত ধরে। কিন্তু তাদের ধ্বংসের একটি অন্যতম কারণ ছিল বিজ্ঞানের অপব্যবহার। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে উন্নত সমরাস্ত্র ব্যবহার করে পরস্পরের প্রাকৃতিক সম্পদের চূড়ান্ত বিনাশ ঘটায়। ফলত: তাদের সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যায়। যুদ্ধ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি নয়। বরং মানুষ যুগে যুগে তার আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসা দিয়ে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করে গেছে। কিন্তু এই সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা যতটা ধর্ম এবং রাজনৈতিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ততটা বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ফলে মানুষে মানুষে ধর্মবিরোধ এবং রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ তৈরী হয়। সঙ্গত কারণেই মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত

হয়ে পড়ে। নিজেরাই ধ্বংস করে নিজেদের তৈরী সভ্যতা।

বর্তমান যুগে ন্যানো টেকনোলজি, জিন ট্রান্সফরমেশন, কোয়ান্টাম মেকানিক্স ইত্যাদি তথ্যপ্রযুক্তির অভিনব উন্নয়ন হলেও অজ্ঞতা কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস অধিকাংশ মানুষের অবচেতন মন থেকে নির্মূল হয়নি বরং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবল ভাবেই রয়ে গেছে। তাই মানুষ তার ব্যবহারিক জীবনে যা প্রয়োগ করছে তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না। বিপত্তিটা এখানেই, প্রকৃতির মধ্যে যে বিজ্ঞান রয়েছে, মানুষ তার স্বরূপ জানতে বা প্রকৃত মূল্য বুঝতে আগ্রহ করছে না। মানুষ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রকৃতির দিকে না তাকিয়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কার গুলিকে ব্যবহার করে যাচ্ছে এবং অতি দুঃখের বিষয় মানুষের মনের বিকাশ বিজ্ঞানের আবিষ্কার গুলির সঙ্গে তাল ও মাত্রা রেখে এগিয়ে যাচ্ছে না। পুরোনো ধ্যান ধারণা, অলীক অন্ধসংস্কার, যুক্তির মাধ্যমে নতুন কিছু গ্রহণ করার ক্ষমতাকে দমিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নিত্যনতুন প্রয়োগ লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই যে কোন আবেগের বশবর্তী হয়ে মানুষ যুদ্ধ নামক ধ্বংসের খেলায় যে কোন সময় লিপ্ত হয়ে যায়। রাষ্ট্রশক্তি তার সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে মানুষের আবেগকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে অন্ধ-উগ্রজাতীয়তাবাদ ও তার ফলস্বরূপ পারমাণবিক বোমার ধ্বংসলীলা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে যে কথাটি বুঝতে হবে তা হল, বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় লক্ষাধিক পারমাণবিক বোমা মজুদ রয়েছে যাদের কোনটাই লিটল বয় থেকে কম শক্তিধর নয়। তাই আজ মানবসভ্যতা এক চরম বিপদের সম্মুখীন।

মানব সভ্যতার ঊষাকালে প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিল প্রায় শূন্য, কিন্তু জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ছিল অদম্য, কল্পনা শক্তি ছিল অসাধারণ, তাই প্রকৃতির সকল রহস্যের উত্তর যখন সমাজের শীর্ষে স্থানীয়রা নানামনজ্ঞ কাহিনীর মাধ্যমে দিত, অন্যরা ধ্রুবসত্য হিসাবে তা গ্রহণ করত। ঐ সময়েই সমাজের নির্দিষ্টরূপ, আচার-বিচার ও প্রাচীন ধর্মগুলির সূচনা হয়। তাই সবধর্মগুলির মধ্যেই দেখা যায় সৃষ্টি রহস্য ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে অসাধারণ সব অলীক কাহিনী। কিন্তু সভ্যতার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির প্রকৃত রূপ যখন মানুষের সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে শুরু হল তখন এই রূপ কথার জগৎ থেকে মানস সভ্যতার উত্তর হওয়া উচিৎ ছিল কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। এর অনেক কারণের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ হল কিছু বুদ্ধিমান লোক তা ঘটতে দেয়নি।

প্রকৃতির মধ্যে যে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক সত্য রয়েছে তা হল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সামঞ্জস্যবিধান করা। যেমন বাঘ হরিণ মারে, কিন্তু সব হরিণ

একসাথে মারে না। তার আহার সংগ্রহের জন্য যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটাই মারে, নিজের খাদ্যশৃঙ্খল অটুট রাখে। প্রাণীরা স্ট্র্যাগল করে কিন্তু যুদ্ধ করে না। তারা নিজ এলাকা সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য চেষ্টা করে কিন্তু যুদ্ধ করে না। কিন্তু মানুষ দলবেধে প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করে নিজ প্রজাতির মধ্যে আত্মঘাতি সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যুদ্ধের মাধ্যমে কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান হয়নি এবং সমস্যা আরো বেড়েছে। কিন্তু মানুষ তার অজ্ঞতার জন্য এই চরম সত্যটি বুঝতে পারে না। মানবসভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, রাষ্ট্রনায়ক থেকে বিজ্ঞানকর্মী ও সাধারণ জনগণ সকলকে বৈজ্ঞানিক চেতনায় সমৃদ্ধ হতে হবে। যুদ্ধ নয় হানাহানি নয় বরং শান্তির জন্য শুধু রাষ্ট্র নয় আন্তর্জাতিক স্তরেও চেলেঞ্জ রয়েছে।

এই চেলেঞ্জ গুলি হল :-

১) পৃথিবীর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।
২) অরণ্য নিধন প্রতিরোধ।
৩) ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ।
৪) সকলের জন্য পরিস্রুত জল সরবরাহ।
৫) উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে শক্তির সাশ্রয়।
৬) অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদন।
৭) সকলের জন্য বাসস্থান।
৮) অপুষ্টি দূরীকরণ।
৯) গ্রীন হাউস এফেক্ট নিয়ন্ত্রণ।
১০) ওজোন গহ্বর নিয়ন্ত্রণ।
১১) অ্যাসিড বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ।
১২) সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা।
১৩) সকলের জন্য শিক্ষা।

এই চেলেঞ্জ গুলি মোকাবিলা করতে হবে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। আমরা জানি বা না জানি চাই বা না চাই বিজ্ঞানই আমাদেরকে স্বার্থক ভাবে ধারণ করে রেখেছে তার অসাধারণ নিয়মনীতির মাধ্যমে। তাই বিজ্ঞানই আমাদের ধর্ম হওয়া উচিৎ। শুধু মানুষের কেন, বিজ্ঞান হল সকল জীবের ধর্ম, নিখিল বিশ্বের ধর্ম, এই ধর্মের সাধনাই আনবে শান্তি – গড়বে সভ্যতা।